জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত

জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত সময় বা কাল জ্যৈষ্ঠ মাসেই এই ব্রত করার নিয়ম । ১ লা জ্যৈষ্ঠ থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত যতগুলো মঙ্গলবার পড়ে ,তার প্রত্যেকে মঙ্গলবারেই নিয়মিতভাবে ব্রতের পালন ও অনুষ্ঠান পালন করিতে হয়।

কুমারী ও সধবারা জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতে পারে ।

জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের দ্রব্য ও বিধান সতেরোটি সুপারি,ধান, দুর্বা ,ফুল ,পাকাআম ,পেইতে ও কাঁঠাল ইত্যাদি। একটা সিঁদুর -কৌটে ,একখানা আয়না ও চিরুনি। প্রথমে আলপনা দিয়া একটি পদ্ম একে তার মাঝখানে কতকগুলো ধান ছড়িয়া দিয়া ওপর ঘট বসাতে হয়

একেই মঙ্গলচণ্ডীর ঘাট বলা হয় । ওই ঘটের গায়ে সিঁদুর দিয়া সবস্তীকের মত দুটি মূর্তি একে দিতে হয় । ঘটে জল ভর্তি করে তার উপরে রাখতে হবে দুটো পান আর একটি কলা ।

ঘটের পাশেই রাখতে হবে ভারা । ওই সময় সাধারনত যে সব ফল পাওয়া যায় তাই দিয়েই ভারা তৈরি করা হয়ে থাকে । এতে দিতে হয় দুটি করে আম ,কলা ,লেবু ,লিচু ,জামরুল ,খেজুর ,গোলাপজাম ,কালোজাম ও সুপারি।

এর ওপরে একটা গোটা কাঠাল ও দেওয়া যেতে পারে । তারপর ভরার পাশের রাখতে হবে জল । ১৭ টি কাঠাল পাতা , ১ টি বেল পাতা একসঙ্গে বেধে ভারার পাশে রাখা কর্তব । ১৭ গাছা দুর্বা ,একটা কলার ঠোলায় পুরে তার কাছে রাখতে হবে।

থওলটির গায়ে যেন সিঁদুর মাখানো থাকে । এর উপর ১৭ টি তুলসী পাতা , ১৭ টি আমন ধানের চাল , ও ১৭ টি যবের চাল , এক টুকরো কলাপাতায় মুড়ে ভরার কাছে রাখতে হবে । প্রত্যেকে ব্রতীর জন্যে একটি সিঁদুর কৌটো ,

একখান আয়না ও একটি চিরুনি দিতে হবে । আর পুরোহিত পূজা করবে প্রত্যেকের নামে সংকল্প করে । পুজোয় সদ্ধ মত ফল মূল ও নৈবেদ্ধ দেয়ার নিয়ম । পূজার শেষে কলার থলায় পোড়া ধান ও যবএর চাল ,

তুলসী পাতা ও কলার সঙ্গে মেখে নিয়া গিলে খেতে হয় । এইগুলো খাওয়ার

Published on: Jan, 09 2023 14:35

সময় সাবধান হয়ে গিলতে হবে যাতে সেগুলো দাতে না ঠেকে যায়। এটাই হলো গদ খাওয়া। এই সম্পূর্ণ গদকে তিনভাগ করে তিনবারে সমস্তটা খেয়ে নেওয়াই বিধি।

ব্রতীরা দিনের বেলা ফল-মূল এবং রাত্তিরে লুচি খেতে পারে কিংবা দিনের বেলায় লুচি আর রাত্তিরে ফল-মূল খেতে পারে।

জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা□ ব্রতকথা শোনার সময় তিনগাছা দূর্বা ও একটি করে ফুল হাতে নিয়ে ব্রতকথা শুনবে, এবং ব্রতকথা শেষ হলে জল খাবে।

শিবের বাড়ি কৈলাস পর্বতে। আকাশ থেকে যেন কোটি কোটি চাঁদের আলো ঝরে পড়ছে সেখানে। গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ ও বিদ্যাধরদের গানে কৈলাসে শিবলোক পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

এমনি একটা দিনে মা ভগবতী পদ্মার সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে এলো যে, মর্ত্যে তাঁর পুজোর প্রচলন হওয়া দরকার তার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই কথা শুনে পদ্মার খুব ভাবনা হলো। সে ভাবতে লাগলো কেমন করে মর্ত্যে মা'র পুজোর ব্যবস্থা হতে পারে। পদ্মার এই ভাব দেখে মা বললেন যে, এর জন্যে কারুকে ভাবতে হবে না, তিনি নিজেই তাঁর পুজোর ব্যবস্থা করবেন। আর করলেনও তাই

“মায়া করি ধরে মাতা জরাতীর বেশে, হাতে লাঠি কাঁধে ঝুলি উড়ি পড়ে কেশে।”

এমনই এক বুড়ীর বেশ ধরে মা চললেন মর্ত্যে। এই বেশে মা উজানী নগরে এক বেনে সওদাগরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এই বেনে সওদাগরের সাতটি মেয়ে, ছেলে একটিও নেই। মা এক বুড়ী ব্রাহ্মণীর বেশে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ঢুকলেন গিয়ে

বেনের বাড়িতে। তখন একেবারে ভর দুপুরবেলা, বাইরে প্রচণ্ড রোদ, তাই ঘরের বাইরে কেউ বেরুচ্ছে না, এমনি সময়ে এসে চাইলেন ভিক্ষে।

বেনেবৌ তখনি চাল আর টাকা থালায় নিয়ে ভিক্ষে দিতে এলেন। ব্রাহ্মণী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হ্যা মা, তোমার ছেলে মেয়ে ক'টি। বেনেবৌ বললো, ‘আমার সাতটি মেয়ে হয়েছে, ছেলে একটিও হয়নি মা।’

বেনেবৌ-এর উত্তর শুনে, মা আর তার হাত থেকে ভিক্ষে নিলেন না। তিনি

বললেন, 'ছেলে আঁটকুড়োর মুখ দেখতে নেই।' এই কথা বলে ব্রাহ্মণী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং কাছেই একটা অশ্বথ গাছের তলায় গিয়ে বসলেন।

এদিকে দুপুরবেলায় এক বুড়ী ভিক্ষে নিতে এসে, ছেলে আঁটকুড়োর মুখ দেখতে নেই বলে চলে গেল। এতে বেনেবৌ-এর খুব দুঃখ হলো, সে ভিক্ষের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বসে বসে কাঁদতে লাগল।

বেনেবৌ-এর কান্না শুনে, সাত মেয়ে ছুটে এলো, দাস-দাসীরা ছুটে এলো, আর স্বয়ং সওদাগর ছুটে এলেন। সকলে বেনেবৌ-এর কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু বেনেবৌ কোনো কথা বলে না।

শেষে সওদাগর অনেক অনুনয় বিনয় করার পর সে বলল সেই ব্রাহ্মণী ভিখারিণীর কথা। বেনেবৌ আরও বলল যে, ভিখারিণী বলে গেছে। যে, মেয়ে আঁটকুড়োর মুখ দেখতে আছে তবুও ছেলে আঁটকুড়োর মুখ দেখতে নেই।

সেই জন্যে বেনেবৌ জেদ ধরেছে যে, ছেলে না হলে সে আর জীবন রাখবে না। বেনে সওদাগর তখন লোকজন নিয়ে বেরুল বুড়ীর খোঁজে। কিছু দূর গিয়েই সওদাগর একটা অশ্বত্থ গাছতলায় বুড়ীকে বসে থাকতে দেখলো।

সওদাগর অমনি গিয়ে বুড়ীর পা দু'খানা চেপে ধরে বললো, "মা আমার বৌ ছেলে আঁটকুড়ো বলে তার হাতে ভিক্ষে নাওনি, এতে তার খুবই দুঃখু হয়েছে। এখন তুমি মা দয়া করে একটা ওষুধ দাও, যাতে সে ছেলের মুখ দেখতে পারে।

বুড়ী সব শুনে চুপ করে রইলো।শেষে অনেক সাধ্য সাধনার পর বললে, 'তুই যখন নেহাতই ছাড়বি না তখন তোকে একটা ফুল দিচ্ছি, এইটা নিয়ে যা। ফুলটা খুব সাবধানে রাখবি। বেনেবৌ যখন অশুচি হবার চারদিন পরে স্নান করে উঠবে,

তখন তাকে এই ফুল ধোয়া জল খেতে বলিস, তাহলে তার চাঁদের মত ছেলে হবে। বুড়ীর কাছ থেকে ফুল পেয়ে সওদাগর ছুটলো বাড়িতে এবং তার বৌয়ের হাতে ফুলটি দিয়ে তাকে সব কথা বলল।

কিছুদিন গেলে, এইবার বেনেবৌ অশুচি হওয়ার পর স্নান করে উঠে সেই ফুল ধোয়া জল খেলে। মা ভগবতীর দয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই বেনেবৌ-এর পেটে সন্তান এল। বুড়ো বয়সে বৌ গর্ভবতী হয়েছে,

এবার তার আঁটকুড়ো নাম ঘুচবে, বাড়ীতে সকলের কী আনন্দ। ক্রমে ন মাসে

বেনেবৌ এর সাধ দেওয়া হল খুব ঘটা করে। এইভাবে দশমাস দশদিন কেটে যাওয়ার পর বেনেবৌ-এর প্রসব বেদনা উঠলো,

কিন্তু প্রসব বেদনায় সে খুব কষ্ট পেতে লাগল, প্রসব আর কিছুতেই হয় না। সকলে খুবই ভাবনায় পড়েছে। এমন সময় একজন বৃদ্ধা এসে বৌয়ের ওই অবস্থা দেখে বললো,

‘বউমা এতো কষ্ট পাচ্ছে, সে একবার মা দুর্গাকে ডাকুক না তিনিই সব দুর্গতি দূর করবেন।” এই কথা শুনে বেনেবৌ কেঁদে কেঁদে মা ভবানীকে ডাকতে লাগলো। এমন সময় কৈলাসে মা ভবানীর সিংহাসন টলে উঠলো।

মা তখন পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হ্যারে পদ্মা, হঠাৎ আমার সিংহাসন এইভাবে টলে উঠলো কেন?” পদ্মা তখন বলল, ‘মা, তুমি যে বেনেবৌকে ওষুধ দিয়েছিলে ছেলে হবার জন্যে আজ ন’দিন ধরে প্রসব বেদনায় সে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে, তাই সে তোমায় ডাকছে।’ পদ্মার কথা শুনে মা’র মনে খুব কষ্ট হলো।

তিনি আবার বুড়ীর বেশে বেনের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। বাড়িতে তখন অনেক লোকজনের যাতায়াত চলছে। মা তখন একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হ্যাগা, কী হয়েছে তোমাদের বাড়িতে এত লোকজন কেন?’ মেয়েটি তখন বুড়ীকে সব কথা বললো।

বুড়ী তখন বলল, ‘আমি কি বৌরাণীকে একবার দেখতে পারি?? মেয়েটি বলল, “কেন পারবে না মা?’ এই বলে মেয়েটি বুড়ীকে নিয়ে গেল পেনেবৌ-এর কাছে। বুড়ী তখন বলল, ‘ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে যাও,

আমি একলা বৌরাণীর কাছে থাকবো, তোমাদের কোনো ভয় নেই।’ বুড়ীর কথা মত সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বুড়ীর বেশে মা ভগবতী বৌরাণীর গায়ে তাঁর পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বেনেবৌ একটি চাদের মত ছেলে প্রসব করল। মা ভবানী তখন ছেলেটিকে একটু আদর করলেন আর বললেন, ‘এর নাম রেখো জয়দেব।’ এই বলে মা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। হঠাৎ আবার মা ভগবতীর সিংহাসন টলে উঠলো। আবার বুড়ীর বেশে মা গিয়ে হাজির হলেন ধনপতি সদাগরের বাড়িতে। তেমনি দুপুরবেলায় সেখানে গিয়ে ভিক্ষে চাইলেন।

ধনপতরি বৌ তখনি থানায় করে। চাল আর টাকা নিয়ে এসে বুড়ীকে ভিক্ষে দিতে এল। বুড়ী তখন তাকে জিজ্ঞেসে করলো, “হ্যাঁ মা, তোমার ছেলে-মেয়ে কটি?’ বনেবৌ বলল, ‘আমার সাতটি ছেলে, মেয়ে হয়নি মা।’

এই কথা শুনে বুড়ী আর ভিক্ষে নিলেনে না, শুধু বলে গেলেনে, ছেলে আঁটকুড়োর মুখ দেখেতে আছে, তবু মেয়ে আঁটকুড়োর মুখ দেখেতে নেই।

এই কথা শুনে বনেবৌ ভিক্ষের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিলো আর নিজে মাটিতে পড়ে খুব কাঁদতে লাগলো। তার কান্না শুনে বাড়ি শুদ্ধ লোক এসে পড়লো তার কাছে, আর কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করতে লাগলো।

কিন্তু বনেবৌ উত্তরই দেয় না। অনেকে সাধ্য সাধনার পর সে বললো যে, এক ব্রাহ্মণী তার হাতে ভিক্ষে না নিয়ে চলে গেছে, আর বলে গেছে ছেলে আঁটকুড়োর মুখ দেখেতে আছে, কিন্তু মেয়ে আঁটকুড়োর মুখ দেখেতে নেই।

এই কথা বলার পর বনেবৌ খুব কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল যে, মেয়ে না হলে সে আর কিছুতেই তার প্রাণ রাখবে না। সওদাগর তখন লোকজন নিয়ে বুড়ীর

খোঁজে বেরুলো। তারা কিছুদূর গিয়েই দেখেলো যে, বুড়ী একটা বটগাছের নিচে বসে আছে। সওদাগর তখন তার পা দুটো ধরে অনেকে অনুনয় বিনয় করে বললো, ‘মা আমার মেয়ে হয়নি বলে তুমি আমার বৌয়ের হাতে ভিক্ষে নাওনি,

সে কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে। এখন কী করে আমার মেয়ে আঁটকুড়ো নাম ঘুচবে দয়া করে তুমি তার ব্যবস্থা করে দাও মা।’ সওদাগরের কথা শুনে মা’র দয়া হলো, তখন তিনি তাঁর ঝুলির ভেতের থেকে একটা ফুল বের করে সদাগরের হাতে দিলেনে

আর বললনে, ‘এটা তুই নিয়ে যা, আর খুব যত্ন করে রাখিস। তোর বৌয়ের অশুচি হওয়ার পর চারদিন পরে শুচি হলে এই ফুলটা ধুয়ে জল খেতে বলিস, তাহলেই ফুলের মতো মেয়ে হবে তার।

এর কিছুদিন পরে বনেবৌ গর্ভবতী হলো। দশমাস দশদিন কেটে যাবার পর প্রসব বেদনা দেখো দিলি, কিন্তু প্রসব আর কিছুতেই হতে চায় না, বনেবৌ খুব কষ্ট পেতে লাগলো। তখন সে কেঁদে কেঁদে মা’কে ডাকতে লাগলো।

এবারেও মা’র সিংহাসন টলে উঠলো। পদ্মা তখন মা’কে বনেবৌ-এর কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললো যে, ‘চার পাঁচদিন ধরে সে খুব কষ্ট পাচ্ছে।’-এই শুনে মা আর থাকতে পারলনে না।

আবার বুড়ীর বেশ ধরে চললেন বেনেবৌ-এর বাড়ি। সেখানে পৌঁছে বাড়ির লোকের মত নিয়ে বুড়ী গিয়ে ঢুকলো আতুড় ঘরে। এখানে বেনেবৌ-এর কাছে যারা বসেছিল, বুড়ী তাদের বললে, ‘তোমরা সকলে একবার ঘরের বাইরে যাও,

আমি একলা একটু বৌয়ের কাছে থাকবো।’ বুড়ীর কথা শুনে সকলে যেন আবিষ্ট হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বুড়ী তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেনেবৌ-এর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বেনেবৌ একটি ফুলের মত মেয়ে প্রসব করলো। মা তাকে নিয়ে একটু আদর করলেন, তারপর তাকে বেনে বৌয়ের কোলে দিয়ে বললেন, এর নাম রেখো জয়াবতী।’ এই বলে মা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ক্রমে জয়াবতী সাত বছরে পড়লো। সে এখন তার সম জুরালে পায়, মলে জিওয়

ধাঁড়ায় কাটে না।

আগুনে জলে ফেলে

দিলে মরণ ঘটে না।

সতীন মেরে ঘর পায়।

রাজা মেরে রাজ্য পায়টি পাড়ার মেয়েদের নিয়ে পুতুল খেলে আবার ঠাকুর পুজোও করে। সে ছেলেখেলার মত বালির নৈবেদ্য, কাঁঠাল পাতা, বেলপাতা, বনের ফুল আর নানান রকমের লতাপাতা দিয়ে আপন মন থেকেই মঙ্গলচণ্ডীর পুজো করতে থাকে।

একদিন সে এইভাবে পুজো করছে এমন সময় জয়দেবের পায়রা এসে বসলো জয়াবতীর কোলে। জয়দেবও পায়রার পেছনে ছুটে ছিল। সে এসে দেখলো পায়রা জয়াবতীর কোলে বসে আছে।

জয়দেব বললে, ‘আমার পায়রা দাও।’ জয়াবতী বললে, ‘বাঃ রে, পায়রা আমার কোলে এসে বসেছে আমি তোমায় পায়রা দেবো কেন? না আমি দেবো না।’

জয়দেবও ছাড়বার পাত্র নয়, সে তার পায়রা নিয়ে তবে ছাড়লো। যাবার সময় সে জয়াবতী আর তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলো, এ তোমরা কী করছো?’ জয়াবতী বলল, ‘আমরা মা মঙ্গলচণ্ডীর পুজো করছি।’ জয়দেব আবার বলল, এতে কী ফল হয়।”

জয়াবতী বলল

“হারালে পায়, মলে জিওয়

খাঁড়ায় কাটে না।

আগুনে জলে ফেলে

দিলে মরণ ঘটে না।

সতীন মেরে ঘর পায়।

রাজা মেরে রাজ্য পায়। ”

এই কথাগুলো শোনার পর জয়দেব বাড়িতে ফিরে এসে গোঁসা ঘরে গিয়ে শুলো। কারুর সঙ্গে কোনো কথাই বলে না ছেলে। বাড়িশুদ্ধ সকলে একেবারে অস্থির। সকলে কত জিজ্ঞাসা করলো যে, কিসের জন্যে তার রাগ হয়েছে,

কিন্তু সে কোনো উত্তরই দিল না। শেষে জয়দেবের মা এসে অনেক অনুনয় বিনয় করতে জয়দেব বললো যে, সদাগরের মেয়ে জয়াবতীর সঙ্গে তার বিয়ে দিলে তবে সে নাওয়া-খাওয়া করবে।

জয়দেবের মা, তার এই কথা শুনে বলল, ‘এরই জন্যে তোর রাগ। এই তোর কথা, এর জন্যে ভাবনা কী, আমি কর্তাকে বলে শীঘ্রই জয়াবতীর সঙ্গে তোর বিয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, ওরা তো আমাদেরই ঘর কিছুই আটকাবে না।’

কিছুদিন পরেই বেনে সদাগর জয়াবতীর বাবা ধনপতি সওদাগরের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালো। ধনপতিও বেনে সদাগরের লোকের মুখে সব শুনে, বিয়ে দিতে রাজী হয়ে গেল আর বিয়ে স্থির হলো। জ্যৈষ্ঠ মাসের মঙ্গলবারে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের জয় মঙ্গলবারের ব্রতের দিন, খুব ধুম ধাম করে জয়াবতীর সঙ্গে জয়দেবের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের দিন রাত্তিরে বাসরঘরে জয়াবতী আঁচলে বাধা গদ বের করে খেয়ে নিলো।

তাই দেখে জয়দেব বললো, ও কী, তুমি কোনো তুক করলে নাকি?/ জয়াবতী বলল, ‘তুক তাক কিছুই করিনি, আজকে জয় মঙ্গলবারের ব্রত করেছি, তার গদ খেলুম।”

বিয়ের পরদিন ধনপতি সদাগর জয়াবতীকে সোনার গহনায় একেবারে মুড়ে দিল, আর অনেক ধনরত্ন দিয়ে বর-কনেকে বিদেয় করল। যাবার সময় জয়দেব তার বাবার সঙ্গে না গিয়ে একটা আলাদা ডিঙ্গীতে করে বৌকে নিয়ে চললো।

ছেলের ইচ্ছেয় তার বাবা কোনো বাধা দিলেন না। খানিক দূর যাবার পর জয়দেব জয়াবতীকে বললো, ‘দ্যাখো এখানে চোরের খুব উপদ্রব, তুমি অনেক গয়না পরে আছো, চুরি যাওয়ার খুব ভয় আছে।

তুমি সমস্ত গয়না খুলে তোমার কাপড়ের একটা পুঁটলি করে আমায় দাও, আমি ওটা কোলে নিয়ে বসে থাকি। আর তুমি আমার চাদরটা পরে থাকো।’ জয়াবতী তাই শুনে গহনাগুলোর একটা পুঁটলি করে জয়দেবের হাতে দিয়ে দিল,

আর জয়দেব সঙ্গে সঙ্গে সেই পুঁটলিটা জলে ফেলে দিল। তার পরেই কৈলাসে মা ভবানীর আসন টলে উঠলো। মা পদ্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আবার আমার আসন টললো কেন পদ্মা?’ পদ্মা বললো, তোমার জয়দেব,জয়াবতীর সব গহনা জলে ফেলে দিয়েছে, এখন কী উপায় হবে?’ দেবী ভবানী তখুনি রাঘব বোয়ালকে ডেকে বললেন, ‘আমার জয়াবতীর সমস্ত গহনা জয়দেব পুঁটলি করে জলে ফেলে দিয়েছে,

তুমি পুঁটলিটা এখুনি গিলে ফেলে পেটের মধ্যে রাখো। আর খাল, বিল, নদী ও পুকুরে যেখানে যত মাছ আছে, তাদের ডেকে বললেন, ‘কাল থেকে তিন দিন তোমরা সকলে গভীর জলের মধ্যে লুকিয়ে থাকবে।’

এদিকে বেনে সওদাগরের বৌ, মেয়েদের নিয়ে ডিঙ্গা বরণ করতে এলো। সকলে দেখলো□বৌয়ের গায়ে একখানাও গহনা নেই। সকলেই বলতে লাগলো যে, বৌয়ের বাবা অত বড়মানুষ হয়ে, মেয়েকে একখানাও গয়না দেয়নি, কি আশ্চর্য! যাই হোক, বেনেবৌ নিজের ঘরের নানা রকম গহনা বৌকে পরিয়ে বৌ বরণ করলো, আর তাকে ঘরে নিয়ে গেলো।

পরের দিন বৌভাত। ভাল মাছ ধরে দেবার জন্যে জেলেদের ওপর হুকুম হলো। জেলেরাও বেরুলো মাছ ধরতে, কিন্তু কোথাও মাছ মেলে না শেষে নদীতে জাল ফেলতে জালে পড়লো সেই রাঘব বোয়াল মাছ, যে জয়াবতীর গহনার পুঁটলি গিলেছিলো।

জেলেরা মাছ নিয়ে সদাগরের বাড়িতে এলো। প্রকাণ্ড মাছ, বাড়ির সবাই খুব খুশি। মাছ কোটবার আয়োজন হলো। কিন্তু বঁটি, কাটারি এমন কি কুড়ুল দিয়েও সে মাছকে কেউ কাটতে পারলো না।

এইসব ব্যাপার দেখে, জয়াবতী তার শাশুড়ীকে বললো, ‘মা, আমি মাছটা কুটবো?’ শাশুড়ী বললো ‘এতো মানুষ পারলে না আর তুমি পারবে? কী বলছো বৌমা?’ জয়াবতী কিন্তু সহজে ছাড়লো না, শাশুড়ীকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিজেই মাছ কুটতে

বসলো। মা মঙ্গলচণ্ডীকে স্মরণ করে সে ছোট বঁটির একটা দুটো কোপ দিতেই মাছটা টুকরো টুকরো হয়ে গেলো আর তার পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো সেই গহনার পুঁটলি।

জয়াবতী তখনই ঘাটে গিয়ে সেই পুঁটলিটা ধুয়ে নিয়ে নিজের সব গহনাগাটি পরে নিলো। তখন সকলেই বলতে লাগলো, “ওঃ! কী গয়নাই দিয়েছেন ধনপতি।’ বেনে সদাগরের বৌয়ের তখন আনন্দ আর ধরে না।

এদিকে জয়াবতীকে সব গহনা ফিরে পেতে দেখে জয়দেব ভাবলো হারালে পায় জয়াবতী তো সত্যিই সব হারিয়ে আবার ফিরে পেলো। সেদিন বৌভাত, সতেরোশো বেনে এসেছে নিমন্ত্রণ খেতে।

জয়দেব গিয়ে চুপি চুপি তাদের বলে দিলো যে, তারা যেন বলে মাছ যে কুটেছে সেই যদি রান্না করে তবেই তারা খাবে তা না হলে খাবে না। তখুনি কথাটা বেনে সওদাগরের কানে উঠলে, বেনে সওদাগর জয়াবতীর কাছে গিয়ে বললো,

‘মা জয়াবতী, তুমি না রান্না করলে কেউ খাবে না বলছে, এখন কী হবে মা? একটা উপায় যে তোমাকে করতেই হবে। এই কথা শুনে জয়াবতী প্রাণভরে মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকতে লাগলো।

জয়াবতীর কাতর প্রার্থনা শুনে, আবার কৈলাসে মা ভবানীর আসন টললো। মা পদ্মাকে বললেন, ‘কী হয়েছে পদ্মা, আবার আমার আসন টললো কেন?’ পদ্মা বললো, ‘তোমার ব্রতদাসী জয়াবতী বিপদে পড়ে তোমাকে ডাকছে।

আজ বৌভাত, সতেরোশো বেনে এসেছে নিমন্ত্রণ খেতে, তারা বলছে জয়াবতী না রান্না করলে কেউ খাবে না। তখন মা ভবানী এক শ্বেত মাছির রূপ ধরে উড়ে জয়াবতীর কাছে গিয়ে – উপস্থিত হলেন।

পরে মা জয়াবতীর কানে কানে বললেন, ‘ভয় কী, তুমি বলো ১৭টি হাড়ি চাই, ১৭টি সরা চাই, আর ১৭ গোছা বড়ী চাই।’ মায়ের কথামতো জয়াবতী গিয়ে শ্বশুরকে ওই জিনিসগুলো আনিয়ে দিতে বললো।

জয়বতীর শ্বশুর তখনি জিনিসগুলো আনিয়ে দিলো। জিনিসগুলো রান্নাঘরে

রেখে দেবার পরে জয়াবতী একখানি চেলী পরে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকে দরজা বন্ধ করে মা চণ্ডীকে স্মরণ করলো। মা অঙ্গুনি এসে উপস্থিত হলেন।

১৭টা উনুন একসঙ্গে জ্বলে উঠলো। দেখতে দেখতে হাড়িগুলোতে রান্না চেপে গেলো আর রান্না হয়েও গেলো অল্প সময়ের মধ্যে। মা তখন জয়াবতীর কাপড়ে আর পিড়িতে একটু হলুদ মাখিয়ে দিয়ে বললেন, ‘এইবার বাইরে গিয়ে বলো সব রান্না হয়ে গেছে।’

রান্না সেরে জয়াবতীকে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে এবং সব রান্না হয়ে। গেছে শুনে বেনে সওদাগরের বৌ একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলো, এখন তার আনন্দের অন্ত নেই।

এত শিগগির সব রান্না হয়ে যেতে দেখে সকলেই জয়াবতীর খুব সুখ্যাতি করতে লাগলো। জয়দেব তখন আবার গিয়ে বেনেদের বলে এলো যে, তারা যেন বলে যিনি রান্না করেছেন তিনি পরিবেশন না করলে কেউ খাবে না।

এই কথা বেনে সওদাগরকে জানানো হবার পর, জয়াবতীর শাশুড়ী গিয়ে জয়াবতীকে বেনেরা যেকথা বলছেন সেই কথাগুলো বললো। জয়াবতী আবার মাকে স্মরণ করতে মা মঙ্গলচণ্ডীও সঙ্গে সঙ্গে এসে দেখা দিলেন এবং জয়াবতীকে বললেন,

তুমি তোমার শাশুড়ীকে বলো, সতেরোশো বেনে একসঙ্গে খেতে বসলে তুমি তাদের পরিবেশন করতে পারবে। তারপর তারা খেতে বসলে তুমি একখানা পাতে সব জিনিস দিয়ে দেবে, তাহলেই দেখবে সব পাতেই জিনিসগুলো পড়ছে।

জয়াবতীর কথা অনুসারে বেনেরা সব একসঙ্গে খেতে বসলো, আর জয়াবতী একখানা পাতে সব জিনিস দিয়ে দিতেই জিনিসগুলো সব পাতেই পড়লো সঙ্গে সঙ্গে।

বেনেরা সবাই খুব তৃপ্তি করে খেয়ে জয়াবতীকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে চলে গেলো। জয়াবতীর বিয়ের পর ৫/৬ বছর কেটে যেতে জয়াবতী গর্ভবতী হলো। বেনেবৌ খুব ঘটা করে সাধ দিলো, গরিব-দুঃখীকে অনেক দান করা হলো। শেষে দশমাস

দশদিনের পর ঘর আলো করে ছেলে এলো জয়াবতীর কোলে। পাচুটের দিন ছেলেকে তেল-হলুদ মাখিয়ে পিঁড়িতে শুইয়ে দিয়ে জয়াবতী পুকুরে স্নান করতে গেলো। এই ফাঁকে জয়দেব চুপিচুপি এসে ছেলেটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে

একটা হাড়িতে ভরে তার মুখে সরা চাপা দিয়ে জলে ভাসিয়ে দিলো। এইবার মা আবার পদ্মার মুখে শুনলেন যে, জয়দেব এবার জয়াবতীর ছেলেকে টুকরো টুকরো করে কেটে একটা হাড়িতে ভরে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে

মা তখুনি শঙ্খচিল হয়ে এসে হাড়িটি তুলে নিয়ে গেলেন, তারপর কাটা টুকরোগুলো একটা পদ্ম পাতায় রেখে অমৃত কুণ্ডের জল তার উপর ছিটিয়ে দিলেন, ছেলেটিও অমনি বেঁচে উঠলো।

তারপর জয়াবতী স্নান সেরে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে তাঁর কোলে দিয়ে দিলেন, আর তাকে বলে দিলেন যে, জয়দেব তার ছেলেটিকে কুঁচো কুঁচো করে কেটে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলো,

সে যেন জয়দেবের কাছ থেকে ছেলেটিকে খুব সাবধানে রাখে। জয়াবতী ছেলে কোলে নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে এলো। জয়দেব এতক্ষণ লুকিয়ে ছিলো, এইবার ব্যাপার কী জানবার জন্যে বাড়ির ভেতর ঢুকতেই ছেলেকে জয়াবতীর কোলে দেখে

একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলো। তারপর ছেলের ষষ্ঠী পূজোর সময় জয়দেব আবার ছেলেটাকে একলা পেয়ে, তার ঘাড় ভেঙ্গে পুকুর ঘাটে কাঠের নীচে পুঁতে রেখে এলো।

এবারেও মা মঙ্গলচণ্ডী পদ্মার মুখে এই কথা জানতে পারলেন। মা তখন জলদেবীকে ডেকে বললেন, ‘আমার ব্রতদাসী জয়াবতীর ছেলেকে জয়দেব তুলে নিয়ে গিয়ে, তার ঘাড় ভেঙ্গে পুকুরের ঘাটের নীচে পুঁতে রেখেছে। জয়াবতী স্নান করে উঠলে ছেলেকে

তার কোলে দিয়ে দিও।’ জয়াবতী স্নান করে ওঠবার পরে জলদেবী মা’র কথামতো ছেলেকে জয়াবতীর কোলে দিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন, ‘মা, জয়দেব তোমার ছেলেকে মেরে রোই কাঠের নীচে পুঁতে রেখেছিলো, জয়দেবের কাছ থেকে ছেলেকে সাবধানে রেখো মা।

জয়াবতী ছেলে কোলে নিয়ে খুব আনন্দে ষষ্ঠী পূজো করলো। এবারেও জয়দেব লুকিয়ে ছিলো, পরে বাড়ি ঢুকেই দেখলো জয়াবতী ছেলে কোলে নিয়ে বসে আছে।

এইভাবে ছ’মাস কেটে গেলো, এইবার ছেলের ভাতের সময় এলো। ছেলের ভাত উপলক্ষ্যে সতেরোশো বেনে এলো নিমন্ত্রণ খেতে। নিমন্ত্রণ পেয়ে অনেক দূর দূর থেকে লোক এলো বেনে সওদাগরের বাড়িতে।

বাড়িতে তখন চললো খুব আনন্দ উৎসব। ক্রমে এসে গেলো ভাতের দিন। জয়াবতী ভাতের দিন ছেলেকে নাইয়ে-ধুইয়ে নানারকম গহনা পরিয়ে রেখে গেলো স্নান করতে। এদিকে জয়দেব সুযোগ খুঁজছিলো।

এই ফাকে সে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে কুমোরদের পোয়ানের ভেতর রেখে এলো। সেইদিনই আবার ছিলো পোয়ানে আগুন দেবার কথা। সেই মতো কুমোরেরা পোয়ানে আগুন দিলো, কিন্তু আগুন ধরল না।

তারা কতো রকমে চেষ্টা করলো কিন্তু আগুন কিছুতেই ধরাতে পারলো না। এদিকে কৈলাসে আবার মা'র আসন টললো। মা পদ্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কী?' পদ্মা বললো, 'আজ তোমার ব্রতদাসী জয়াবতীর ছেলের ভাত।

সে ছেলেকে শুইয়ে রেখে গিয়েছিলো স্নান করতে, সেই সুযোগে জয়দেব ছেলেটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে কুমোরদের পোয়ানের ভেতর রেখে এসেছে।' পদ্মার মুখে সব কথা শুনে, মা আবার এক বুড়ী ব্রাহ্মণীর বেশ ধরে নেমে এলেন মর্ত্যে।

কুমোরেরা তখন অনেকজন মিলে পোয়ানে আগুন ধরাবার চেষ্টা করছে। মা কুমোরদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাগা, তোমাদের এখানে এতো ভীড় কিসের?' কুমারেরা বললো,

'মা, আমরা পোয়ানে কিছুতেই আগুন ধরাতে পারছি না, যতো বের চেষ্টা করছি আগুন কিছুতেই ধরছে না। আমরা বুঝতে পারছি না ব্যাপার কী।' মা তখন তাদের সরে যেতে বলে পোয়ানের ভেতর থেকে ছেলেটিকে বার করে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পোয়ানেও আগুন জ্বলে উঠলো।

মা তারপর ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে জয়াবতীর কোলে দিয়ে বললেন, 'তোমায় কতোবার বলেছি যে, ছেলেটিকে সাবধানে রেখো মা, তা তুমি পারছো না। আজ জয়দেব তোমার ছেলেকে নিয়ে গিয়ে কুমোরদের পোয়ানের ভেতর রেখে এসেছিলো।

এই কথা বলে জয়াবতী এবং তার ছেলেকে আশীর্বাদ করে মা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সন্ধ্যের পর জয়দেব বাড়ি ঢুকে দেখলো যে, ছেলে বেশ আনন্দে মায়ের কোলে বসে খেলা করছে। এইবার জয়দেব বুঝলো,

তিনবার চেষ্টা করেও যখন ছেলেটার কোনো ক্ষতি করা গেলো না, তখন এ কথা মানতেই হবে যে, ব্রতের ফলের হয়তো অন্যথা কখনো হয় না। এরপর আর একদিন শেষ দেখবার জন্যে জয়দেব একখানা কাটারি দিয়ে ছেলেটাকে

Published on: Jan, 09 2023 14:35

কাটতে আরম্ভ করলো।

এমন সময় জয়াবতী এসে বললো, ‘এ কী করছো তুমি? এত রকম করেও তোমার বিশ্বাস হলো না মা মঙ্গলচণ্ডীর ওপর? জয়দেব বেশ খানিকটা লজ্জিত হয়ে বললো, হ্যা এইবার আমার বিশ্বাস হয়েছে।

তারপর থেকে জয়দেব আর কোনো অঘটন ঘটানোর চেষ্টা করলো না। জয়াবতীকে নিয়ে সে বেশ সুখে ঘর করতে লাগলো। পরে তাদের আরও কয়েকটি ছেলে-মেয়ে হলো। জয়াবতীর শ্বশুর ও শাশুড়ী নাতি-নাতনীদের মুখ দেখে খুব আনন্দে দিন

কাটিয়ে শেষে স্বর্গে চলে গেলো। জয়াবতী আর জয়দেব, তাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে মা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের কথা প্রচার করলো এবং তাদেরও প্রচার করতে বলে দিলো।

তারপর এক শুভদিনে স্বয়ং ভগবান পুষ্পক রথ পাঠিয়ে দিলেন। জয়দেব ও জয়াবতী জীবন্ত অবস্থায় সেই রথে চড়ে স্বর্গে চলে গেলো। সকলে তাদের এই অবস্থা দেখে খুব ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

সেই থেকে জয় মঙ্গলবারের ব্রতকথা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়লো।

জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের ফল যে স্ত্রীলোক জয় মঙ্গলবারের ব্রত পালন করে, সে কখনো জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, কোনো অস্ত্রের ঘায়ে তার মরণ হয় না আর তার হারানিধি ফিরে পেয়ে থাকে।